'প্রস্তাবনা'

'শনিবারের চিঠি' নামক বাংলা সাময়িক পত্রিকাটি বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে একটি প্রবল বিতর্ক ও তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরোধিতায় এই পত্রিকাটি যেভাবে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করেছিল, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে রক্ষণশীলতা, আক্রোশ, স্থূল ইতরতা ও বিদ্বেষ যেভাবে ফুটে উঠেছিল, তার ফলে সে সময়ে তো বটেই, বর্তমান সময়েও পত্রিকাটি একটা নোংরা 'হলুদে কাগজ' মাত্র বলেই সুধী সমাজে উপেক্ষিত ও অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছিল, — বড় জোর পত্রিকাটিকে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সস্তা ও সাময়িক কণ্ডুয়ন বলে উপেক্ষা করার মনোভাবটি ঐতিহাসিক ও সমালোচক-মহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ সে সময়ে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও শক্তি রবীন্দ্রনাথ-সহ বহু মনীষীর স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং বাংলা সাহিত্যের নবীন ও প্রবীণ লেখকদের কাছে পত্রিকাটি একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাটির নিজস্ব কোন ইতিবাচক ভূমিকা ও সামর্থ্য না থাকলে তার পক্ষে এত দীর্ঘ দিন এমন দাপটের সঙ্গে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। কেবল মিত্র শিবিরের উচ্ছ্বসিত বক্তব্যেই নয়, সাধারণভাবে সুধী সমাজের সুস্থ চিন্তায় এই কথা আজ উচ্চারিত হচ্ছে যে, 'শনিবারের চিঠি'র উগ্রতা বাদ দিলেও তার বক্তব্যে ও ক্রিয়াকলাপে কিছু সত্য ছিল। অর্থাৎ, যে বিশেষ পরিস্থিতিতে 'শনিবারের চিঠি' আবির্ভূত হয়েছিল, তাতে তার প্রয়োজন ও যাথার্থ্য বিচার করার অবকাশ আছে। সময়ের ব্যবধানে সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন আজ খুব অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। বর্তমানের আলোচনা সেই উদ্দেশ্যেরই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'শনিবারের চিঠি' মুখ্যত সাহিত্য পত্রিকা ছিল না, 'জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রকার 'বোগাসিটি'কে লক্ষ্যগোচর করানো ও সেগুলিকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যই পত্রিকাটিকে ক্রিয়াশীল রেখেছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, এমন কি ছোট-বড় বহু ঘটনা তার অবলম্বন ছিল। জীবনকে সমগ্রভাবেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পত্রিকাটির ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন প্রতিক্রিয়া-জাত ক্রিয়া-কলাপই প্রাধান্য পেয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা, তার প্রশংসা ও নিন্দা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্ততঃ স্বাধীন ভারতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র সকল দিকেই আধুনিক

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপ একান্ত বা একমাত্র ছিল বলে দেখা যায়। এই বর্তমান আলোচনায় আমরা সেই দিকটির উপরেই নির্ভর করতে চেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা, তথা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সেই উত্তপ্ত পরিবেশের বাইরে থেকে সাহিত্যের রাজ্যে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়াটিকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিল; 'রবীন্দ্রনাথের পর একটা নতুন সুর' সৃষ্টি করতেই যেন বেশি ব্যগ্র ছিল। 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোক্তা ও লেখকরাও কেউই রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কারের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন মূলতঃ সাহিত্যসেবী। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র চরিত্রটিকে ঠিকমত বুঝতে গেলে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তা ও কার্যধারাগুলিকেই বিশ্লেষণ করা দরকার। তৃতীয়তঃ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই জীবনের চলমানতা প্রবাহিত হয়। ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে স্বরূপ চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল, বিশ শতকে তার বিবর্তিত রূপটিই অনিবার্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তার প্রবৃত্তির মূলেই যখন ধাক্কা লেগেছিল, একটা প্রবলতর সাহিত্যাদর্শ সম্ভাবনাযুক্ত হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র মাধ্যম 'কল্লোল' - গোত্রীয় পত্রিকাগুলিই ছিল না, রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকাগুলিও নেতিবাচক ভঙ্গিতে সেই 'পরিবর্তনের ধাত্রী' হতে চেয়েছিল। এই শেষোক্ত পত্রিকাগুলির দ্বন্দ্ব, সংশয় ও স্ব-বিরোধে সেই বিশিষ্ট যুগ-পরিপ্রেক্ষিতটি আভাসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত ভূমিকাটিকে বিচার করা দরকার ইতিহাসের স্বার্থেই। 'সবুজ পত্রের' পর 'কল্লোল' এবং 'কল্লোলের' পর 'পরিচয়,' 'কবিতা,' — এই ধারাস্রোতটিকে বুঝতে গেলে সে সময়ের বিতর্কিত ও প্রগতি-বিরোধী পত্রিকাগুলিরও পর্যালোচনা দরকার। 'শনিবারের চিঠি' কেবল এই শ্রেণীর পত্রিকা-গুলির মধ্যে প্রধান ছিল, তাই নয়, তার মধ্যে এই লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে আলোকপাত করতে চাইলে 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্য-চিন্তা ও কার্যকলাপ অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। এই সকল কারণেই আমাদের মূল বিষয় — 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা।"

'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব হয়েছিল ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে, কিন্তু মাত্র আট মাস তার পরমায়ু ছিল। তার পর ১৩৩৪, ভাদ্র মাস থেকে পত্রিকাটি মাসিক জীবন লাভ করে সাময়িক বিরতি সত্ত্বেও দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিশিষ্ট অবদান ও ভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। সাপ্তাহিক জীবনের মধ্যে তার মাসিক জীবন সম্পূর্ণতঃ না মিললেও 'শনিবারের চিঠি'র পরিণত জীবনের অঙ্কুর সেই অকিঞ্চিৎকর স্বল্প কালেই জাগতে সুরু করেছিল। আমাদের আলোচনার সময়-পরিধি সেই পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পর আর অগ্রসর হতে চাই নি। আমাদের যুক্তি — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র দুটি রূপ প্রকাশ পেয়েছিল, একটি তার দূষণ বা ধ্বংসাত্মক ভূমিকা, অপরটি তার রক্ষণ, পালন ও সেবা-মূলক ভূমিকা। তৃতীয় দশকেই 'শনিবারের চিঠি'র আধুনিক সাহিত্য-বিরোধিতা স্পষ্ট ও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকাটি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সংস্কার এই পর্যায়ের ভূমিকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পত্রিকাটির আরও যে একটা ভূমিকা ছিল, — নতুন প্রতিভার সন্ধান, প্রশ্রয় ও আনুকূল্য — সহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ হয়ে ওঠা, সেই গঠনমূলক পরিচয়টিকে জানতে গিয়েই আমাদেরচল্লিশের কোঠায় পৌঁছতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক সাহিত্য-পত্রিকা হয়ে উঠলেও কেন আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সে কুণ্ঠিত এবং বিদ্বিষ্ট, তার স্বরূপটিকে জানতে গেলেও তিরিশের দশক পেরোতে হয়। এই সময়কালে 'শনিবারের চিঠি' 'রোষ থেকে রসের' ক্ষেত্রে সরে এলেও তার দূষণাত্মক ভূমিকা কিছুমাত্র কমে নি, সীমাবদ্ধ হয়েছিল মাত্র। কিন্তু চল্লিশের দশকের পর পত্রিকাটির আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে নূতন বা বিশিষ্ট তেমন কোন লক্ষণ আর পাওয়া যায় নি, — বরং চল্লিশের দশকই এর পর থেকে অব্যাহত থেকেছে। সুতরাং আমাদেরও আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আলোচনার ঊর্ধ্ব কাল-সীমা আমরা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দকেই গ্রহণ করতে চেয়েছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গে একটা যুগও যেমন শেষ হয়ে গিয়েছিল, 'শনিবারের চিঠি'র আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সকল বিশিষ্টতাও এই সময়কালেই পরিপূর্ণভাবে ধরা পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন কার্যতঃ 'শনিবারের চিঠি'র মূল কেন্দ্র। তাঁর কাছে প্রত্যাশা ও আশীর্বাদ সূচক নালিশ নিয়েই পত্রিকাটি যাত্রারম্ভ করেছিল, আধুনিকদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁকেই মূল প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়ে পত্রিকাটি জটিল পথ-পরিক্রমা করেছিল, পরিশেষে তাঁরই আশ্রয়ে ফিরে এসে 'শনিবারের চিঠি' তার কর্ম-বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করেছিল। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে পত্রিকাটির মোহ ও মোহভঙ্গ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথকেই উপলক্ষ করে। তৃতীয়তঃ এর পর থেকে 'শনিবারের চিঠি'র

দ্বিতীয় একটি পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছিল — স্বাধীন ভারতের সমাজ উন্নয়ণে তার বিশিষ্ট ভূমিকা, সেই পরিচয়টি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত পর্যালোচনা দাবি করে। আমাদের বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ইতিমধ্যেই আধুনিক লেখকেরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁরা আর তেমন কোন প্রবীণ সাহিত্য-সম্রাটকেও পান নি — যার কাছে নালিশ জানানো যায়, বা অভিযান-উৎপাত করা সাজে। সে চেষ্টাও অতঃপর তাঁরা করেন নি। আমাদের বিশ্বাস — উৎপত্তিকাল থেকে রবীন্দ্র-প্রয়াণ কাল-(১৩৩১-১৩৪৮)— এই কাল-পর্বেই 'শনিবারের চিঠি'র আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত ভূমিকার পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকাটিকে জানতে গিয়ে আমরা মূলতঃ পত্রিকাটির বক্তব্য, ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গীটিকেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। আমরা জানতে চেয়েছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র অভিযোগ গুলি কি কি ছিল, কেন তাঁরা এমন উৎকটভাবে প্রগতি-বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিলেন। আমরা পত্রিকাটির যুক্তি ও কার্য-পরম্পরার বিশ্লেষণের ওপর যতটা জোর দিয়েছি সেগুলির বিচারের ও মূল্যায়নের দিকে ততটা গুরুত্ব দিতে চাই নি। কারণ পত্রিকাটির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকার বিশ্লেষণের প্রয়োজনই বেশি — এগুলি তো চিরতরে অবলুপ্তির পথে। আর তা করতে গিয়ে আলোচনার পরিধি এমন ভয়াবহ রকমের বিশাল হয়ে উঠেছে যে সেই সকল বক্তব্য ও ভূমিকার তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ বিচার করার অবকাশ কমে গেছে। যোগ্যতর ব্যক্তি ভবিষ্যতে সেই কর্তব্য পালন করতে পারবেন — এই বিশ্বাসেই তাঁদের কাছে এই মূল্য-প্রায় তথ্যগুলি উপস্থাপিত করতে চেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের চিন্তাধারার বিস্তৃত পরিচয় নিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে মৃত কিছুটা সংস্কার বা ভাবালুতার শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সেদিকে খুব বেশি জোর দিতে চাই নি। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনাটিকে করতে চেয়েছি — 'শনিবারের চিঠি'র সাহিত্য-চিন্তার ইতিহাস,— তার সমালোচনা নয়। এটিকে 'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাস বলাই সঙ্গত।

মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমরা অনিবার্য প্রয়োজনবোধে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতটিকে চিনে নিতে চেয়েছি। 'ভূমিকা ও পূর্বসূত্র' তাই আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণগুলিকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' ঠিক কোন্ সময়ের কী ধরণের সাহিত্যকে কেন আক্রমণ করেছিল, তার হেতু ও

অংশপর্যটিকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব ও যুদ্ধোত্তর কালের যুগ-মানসের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইলেও তা যে বাংলা সাহিত্যের ধারা-বিবর্তনের সূত্রেই সূচীত হয়েছিল, এবং 'শনিবারের চিঠি'র সমরূপ ক্ষেত্রের অভিযোগ সমূহেরও যথার্থতা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার 'ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারে'র সূত্রগুলিকে সংক্ষেপে স্মরণ করেছি। এর ফলে দু পক্ষের বক্তব্যগত সত্য যেমন প্রকাশ পাবার সুযোগ পেয়েছে, তেমনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশ্য, বক্তব্য ও ভূমিকাগত বিশিষ্টতা ও কৃতিত্ব তেমনি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গেই সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার মানসিকতা ও অবদানের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তির খোঁজে আমরা 'রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট'কেও স্মরণ করেছি। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়টিতে আমরা মূল আলোচনার প্রস্তাবনা করতে চেয়েছি। আমরা দেখতে চেয়েছি আধুনিক সাহিত্য যেমন, 'শনিবারের চিঠি'ও তেমনি, সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাস্রোতের অর্থ এবং যুগের অনিবার্য ফসল কি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সাধারণভাবে 'শনিবারের চিঠির পরিচয়' উল্লেখ প্রসঙ্গে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য, ভূমিকা, পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক উপকরণ ও লক্ষণগুলিকে পর্যালোচনা করেছি। 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত মনোভাব-এর উল্লেখ করা হয়েছে 'মুখবন্ধ' নাম দিয়ে। পত্রিকাটি সম্পর্কে সযত্ন অন্বেষণের প্রয়োজন এবং পত্রিকাটির বিশিষ্টতা বুঝতে গেলে এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আবশ্যক হয়। এর পরেই শুরু হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র জীবনবৃত্তান্ত। 'উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে 'শনিবারের চিঠি'র-উদ্ভবের কারণ ও তার জন্মকালীন উদ্দেশ্যের বিবর্তনের সূত্রগুলিকে আলোচনা করেছি। 'উদ্ভব ও পর্যায়' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পত্রিকাটির উদ্ভবকালীন পরিবেশ, আয়োজন ও সংশ্লিষ্ট উপাদান-উপকরণ-সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গেই সমগ্র 'শনিবারের চিঠি'র জীবনকে কয়েকটি নির্দিষ্ট 'পর্যায়ে' বিন্যস্ত করে তার উদ্দেশ্য, বক্তব্য ও ভূমিকার ক্রম-পরিণতির ইতিহাসটিকে বোঝাতে চেয়েছি। পত্রিকাটির সম্পাদক সমূহের পরিবর্তনে তার মূল চরিত্রটির পরিবর্তন কেন ও কিভাবে স্থিরীকৃত হয়েছিল, তার অনুসন্ধানই এই পর্যালোচনার কারণ। এই অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র 'আড্ডা ও লেখক' পরিচয়। পত্রিকাটির প্রেরণা ও কর্মকৌশল এবং শক্তি-সংগ্রহের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে, এবং 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোক্তাদের যথার্থ মূল্যায়নের সূত্র ধরে তাঁদের সাহিত্যের আসরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ,

লেখক ও তাঁদের ছদ্মনাম বা বিনামী হওয়ার কারণ এবং 'শনিমণ্ডল', 'শনিচক্র' প্রভৃতি কৌতূহলোদ্দীপক আলেখ্যগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় থেকেই মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়েছে । এই অধ্যায়টিকে আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকার 'সূচনাপর্ব' বলে অভিহিত করতে চেয়েছি । পত্রিকাটির সাপ্তাহিক ও বিশেষ সংখ্যাগুলিকে (১৩৩১-১৩৩৩) এই পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়েছে । অর্থাৎ আমরা বলতে চেয়েছি আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র ভূমিকা পত্রিকাটির মাসিক জীবনে (১৩৩৪ থেকে) সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও, এবং তার সাপ্তাহিক কর্মকাণ্ডে হাল্কা মেজাজ ও চপলতা প্রাধান্য পেলেও এই সময়েই ধীরে ধীরে পত্রিকাটির ভূমিকা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল এবং তা নির্দিষ্টভাবে প্রকাশও পাচ্ছিল । প্রকৃতপক্ষে উইট্ ও হিউমারের চাতুর্য দেখাতে এবং গৌণভাবে স্বরাজ্য পলিটিক্সকে আক্রমণ করতে এসে নজরুল-বিরোধের আকস্মিক উপলক্ষে সাহিত্যের পালে হাওয়া লাগলেও 'কল্লোল' - পত্রিকায় ভাব-ভাষা-আঙ্গিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, 'শনিবারের চিঠি'র যথার্থ কর্মক্ষেত্র তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল । সাপ্তাহিকটির অকাল-মৃত্যু যে তাঁদের 'অভিনব উদ্দেশ্য'টিকে সাময়িকতার তুচ্ছতা থেকে মুক্ত রেখেছিল, তার নিশ্চিত প্রমাণ বিশেষ 'বিরহ' সংখ্যা (১৩৩৩)। এই 'উদ্দেশ্য'ই সময়ের ও প্রয়োজনের আনুকূল্য পেয়ে মাসিক পর্বগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল । সেই কারণেই মূল আলোচনার পরিধি থেকে এগুলিকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় ।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'উদ্যোগপর্ব' । ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে পৌষ — এই পাঁচটি সংখ্যায় সম্পাদক শ্রী যোগানন্দ দাসের নেতৃত্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব নিষ্পন্ন করা হয়েছিল । আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্যগুলি এই পর্বে সুনির্দিষ্ট ভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, এবং এঁদের আক্রমণের কর্মপন্থারও সুস্পষ্ট আভাষ দেওয়া হয়েছিল । এরই সূত্র ধরে শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে 'শনিবারের চিঠি' ১৩৩৪-এর মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৩৫-এর ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত — মোট আট মাস কাল-ব্যাপী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 'সংগ্রাম' শুরু করেছিল । পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সেই সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়টি বিশ্লেষণ করেছি । ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এই সংগ্রামেরই চূড়ান্ত

রূপ —'সর্বাত্মক অভিযান' । ১৩৩৫-এর আশ্বিন সংখ্যা থেকে ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত — মোট এক বৎসর দুই মাস কাল শ্রী সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'কে বাংলা দেশের সকল ক্ষেত্রে একটা ত্রাস সৃষ্টির হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন । মোটামুটিভাবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকেরাই এই অধ্যায়গুলির (চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়) সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিলেন । এই লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল — মূলতঃ অশ্লীলতা, তথা যৌনতা, সম্পর্ক-বিরুদ্ধ অনাচার, সমাজ-কল্যাণ ও মূল্যবোধের বিপর্যয়, ঐতিহ্য অস্বীকৃতি ও রবীন্দ্র-বিরুদ্ধতা এবং ভাষা, রীতি, আঙ্গিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতি-নিয়মভঙ্গ, যথেচ্ছাচার, কষ্ট-কল্পনা, কৃত্রিমতা, অক্ষমতা ও দুর্বোধ্যতার দম্ভ । বিদেশী সাহিত্য-জাত উপ-আদর্শের অন্ধ ও অক্ষম অনুকৃতি এই সাহিত্যের মূল বিষবৃক্ষ বলে 'শনিবারের চিঠি'র বিশ্বাস ছিল । এই ধরণের রচনা কেবল সাহিত্যের স্বর্ণরাজ্যকেই কলুষিত করে নি, চারিত্র ধর্মও সমাজ-শৃঙ্খলার পক্ষেও এগুলি যে বিষবৎ — এই বিশ্বাসই পত্রিকাটিকে আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল । তরুণ লেখকদের সঙ্গে তাঁদের প্রশ্রয়দাতা রূপে নরেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, চারুচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, এমন কি রবীন্দ্রনাথও আধুনিকদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রত্যাশামত সোচ্চার না হওয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন; সমালোচিত হয়েছিল প্রচলিত সাধারণ মাসিক পত্রিকাগুলিও । সমগ্র আক্রমণের ইতিহাসটিকে আমরা 'প্রথমপর্ব' বলে চিহ্নিত করেও উপরিউক্ত তিন সম্পাদকের আমলে আক্রমণ পরিচালনার বিশিষ্টতাগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে এবং পত্রিকাটির ক্রম-পরিণতির সূত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রথম পর্বটিকে তিনটি 'পর্যায়ে' বিন্যস্ত করেছি ও সেইরূপ নামকরণ করেছি ।

'শনিবারের চিঠি'র সর্বাপেক্ষা কলঙ্ক-জনক ভূমিকা পর্যালোচিত হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে, অথচ এই অধ্যায়েই সূচীত হয়েছিল পত্রিকাটির নবতর ও ইতিবাচক কার্যক্রম । প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসর 'ঘুমিয়ে সমিধ সংগ্রহ' করে 'শনিবারের চিঠি' শ্রী সজনীকান্ত দাসের পরিচালনায় তাঁর 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় আত্মনিয়োগ করার মুহূর্ত পর্যন্ত (১৩৩৮, আশ্বিন — ১৩৩৯, অগ্রহায়ণ) — এক বৎসর তিন মাস আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ তুলে 'বিচিত্র মারের খেলা' দেখিয়েছিল, বিদ্বেষে-বীভৎসতায় একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, এবং তাঁদেরই 'বৃহস্পতি গুরু' রবীন্দ্রনাথকে বর্বরোচিত আক্রমণে বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল । দীর্ঘ বিরতির পর এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল বলেই নয়, এই পর্বেই আবার দেখা গিয়েছিল 'ভাঙনের স্থূল মজুরদের'

সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে । এঁদের দলপতি ও আত্মিক নেতা 'শুক্রাচার্য গুরু'-রূপী মোহিতলালই প্রথম পর্বের মত এই পর্বেও আধিপত্য বিস্তার করলেও 'শনিবারের চিঠি'র 'পালাবদলে' তাঁর সায় ও সহায়তা ছিল না । বরং সজনীকান্তই এই পরিবর্তন-মুখী ভূমিকার সেনাপত্য গ্রহণ করেছিলেন । এই সকল কারণেই এই পর্বটিকে পৃথক 'দ্বিতীয় পর্ব' হিসাবে চিহ্নিত করে তার নামকরণ করতে চেয়েছি 'যোগ ও যোগভ্রষ্ট' । এই পর্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রবীন্দ্র-বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হলেও আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রেখে এই বিরোধী পরিপ্রেক্ষিত-টিকে প্রাসঙ্গিক সূত্র হিসাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করে আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকায় পত্রিকাটির ক্রিয়াকলাপকে সীমিত রাখতে চেয়েছি । সমরূপ প্রয়াস ছিল প্রথম পর্বের প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত বিরোধে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের কোলাহলে ।

শ্রী সজনীকান্ত দাসের আমলে 'শনিবারের চিঠি'র শেষের দিকে 'যোগভ্রষ্ট' ও 'পালাবদলের' যে সূচনা দেখা দিয়েছিল, শ্রী পরিমল গোস্বামীর সম্পাদকত্ব-কালে (১৩৩৯, পৌষ – ১৩৪৩, আষাঢ়) দীর্ঘ তিন বৎসর সাত মাস পত্রিকাটি ধীরে ধীরে 'সাহিত্যিক সমাজের কৌতূহলোদ্দীপক' অবস্থা থেকে 'কোটারিমুক্ত একটা সার্বজনীন রূপ' পরিগ্রহ করেছিল, + সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধনায় প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছিল এবং সুধী সমাজের কাছে তার মর্যাদা ও আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছিল । এই পর্বে আক্রমণের ধার ক্ষেত্র-বিশেষে দেখা গেলেও সাধারণভাবে 'রোষের জগৎ রসের জগতে' রূপান্তরিত হয়েছিল । 'শনিবারের চিঠি'র এই বিশিষ্ট প্রবণতা ও ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের এই পর্যালোচনাটিকে তৃতীয় পর্ব : 'পালাবদল' বলে অভিহিত করেছি । পরিমলবাবু নিজেও এই পর্বটিকে 'তৃতীয় পর্ব' বলে উল্লেখ করেছিলেন । এই পর্বের কৃতিত্বও তাঁরই ।

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র সর্বশেষ বা চতুর্থ পর্ব শুরু হয়েছিল 'বঙ্গশ্রী'-প্রত্যাগত শ্রী সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি'তে আজীবন আত্মনিয়োগ করার সময় থেকে (১৩৪৩, শ্রাবণ – ১৩৬৮, পৌষ) । এই সুদীর্ঘ সময়কালে 'পরিচয়' ও 'কবিতা' গোষ্ঠীর লেখকদের অনুশীলিত আধুনিক কাব্যচর্চা সম্পর্কে দুর্বোধ দুষ্ট সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে সত্য, এমন কি 'শনিবারের চিঠি'র তথাকথিত 'চরিত্র' ও স্বাদটিকে বজায় রাখতে গিয়ে তিক্ত-কষায় ও অম্ল-মধুর মন্তব্যাদি পরিবেশিত হলেও

আধুনিক কথাসাহিত্যের ধারাটিকে যেভাবে এঁরা লালন করেছিলেন, নতুন প্রতিভার অন্বেষণ ও আনুকূল্য সৃষ্টি করে যেভাবে তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন, এবং গবেষণা, রবীন্দ্রানুশীলন ও সমাজ-উন্নয়নমূলক ভূমিকায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছিলেন, তা বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে সত্যই একটি দুর্লভ ও কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাটির ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্তই পত্রিকাটির কার্যক্রমকে গ্রহণ করেছি, এবং শ্রী প্রবোধকুমার সান্যালের কৃতজ্ঞতা-সূচক ভাষাটিকে গ্রহণ করে এই পর্বের নামকরণ করেছি 'বনস্পতির বৈঠকে'। আমরা বিশ্বাস করি এই নামকরণের মধ্যেই এই পর্বের 'শনিবারের চিঠি'র আধুনিক সাহিত্য-সম্পর্কিত ভূমিকাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই পর্বটির পরেও আধুনিক সাহিত্যের সেবায় পত্রিকাটির অবলম্বিত কার্যক্রম প্রসারিত হলেও নতুন ও বিশিষ্ট কোন ভূমিকা সেখানে দেখা যায় নি, সেই পর্বের অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছিল 'সমাজ দর্পণে'র প্রতীকার-রূপে,— আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলেই আমাদের অনুসন্ধান এখানেই শেষ হয়েছে।

দশম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। এই অধ্যায়ে আমরা সূত্রাকারে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র অভিযোগ সমূহের যথার্থতা ও কালোত্তীর্ণ মূল্য নির্দেশ করেছি, এবং 'শনিবারের চিঠি'র বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির অবদান আলোচনা করেছি। আলোচনার পরিধি ইতিমধ্যেই ভারাবহ ও বিরক্তি উৎপাদক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা ভেবেই এই অধ্যায়টিতে আমরা বিচার সূত্রগুলিকে বিস্তারিত করিনি। একই কারণে ইচ্ছা থাকলেও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত ব্যঙ্গ সাহিত্যের ও সৃষ্টিশীল রচনাসমূহের বিশিষ্টতা প্রদর্শনের প্রয়াসকে সংযত করতে হয়েছে।

পরিশিষ্টে পরিবেশিত হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের ব্যবহৃত ছদ্মনাম। 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য ও বিষয়, 'শনিবারের চিঠি'র বিষয়-ভিত্তিক সূচী, এবং গ্রন্থপঞ্জীতে পরিবেশিত হয়েছে, গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার তালিকা।